OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - iv, October 2025, TIRJ/ October 2025/article - 74
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 626 - 632
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - iv, Published on October issue 2025, Page No. 626 - 632
Website: https://tirj.org.in/tirj, Mail ID: editor@tirj.org.in
(SJIF) Impact Factor 7.998, e ISSN : 2583 - 0848

চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত ও হুগলি অঞ্চলের জমিদারি জীবনযাত্রার রূপরেখা

কৃশানু ঘোষ
Email ID: krirshanughoshdnk@gmail.com
0009-0000-8933-5226

Received Date *28. 09. 2025*
Selection Date *15. 10. 2025*

Keyword
Landlords, Monotheism, Sati, Renaissance, Paganism, Vaishnavism, Landowner, Baboo.

Abstract

After the introduction of permanent settlement, the landlords became direct owners of the land and the revenue rate was fixed permanently for them. Initially, Many zamindaris changed hands and a new class of landlords emerged on the land. Many of them living in the cities. Since the royal rate was fixed and no separate agreement was signed between the government and the farmers there was a great opportunity to collect money from the land. This abundance of the money in the life of the landlords completely changed their standard of living. Due to their good relations with the government, the landlords became a privileged classes and started living with extreme luxury and entertainment. The expression of their luxurious life started to blossom in various ways and give rise to a competition among themselves. And when the competition among the landlords increaseincreased, the expenditure on social and religious ceremonies also increase. The main burden of this increase in expenditure was borne by the common farmers, who, having no protection in the permanent settlement, were exploited by the landlords. The common poor peasants of the Hooghly District were the sole provider of all the necessity of life for the landlords. Another factor connected with the luxury of the landlords life was there since all the work was done by their subordinate, there was no shortage of time in their life. And for this reason the first steps of social reforms and nationalism emerged from among the class of landlords The earliest proponent of which was Raja Ram Mohan Roy, a resident of khanakul in Hooghly District, based on the ancient Upanishad, he declared direct war against polytheism, paganism and caste system. And based on the ancient Upanishad he declared that God is one and unique. This is a revolutionary decision of that time which was taken by him. Many superstitious Zamindar of his time not fully support Roys view, but Ram Mohan Roy proved his decision of the basic of religious documents. It was through the brahmo movement initiated by Ram Mohan Roy that the sense of patriotism and nationalism spread everywhere. This article discusses various aspects of the life and working method of the landlords in the Hooghly District region after the introduction of permanent settlement.

Discussion

জমিদাররা বাংলার অন্যান্য স্থানের মতো হুগলি জেলাতেও ছিল একটি সুবিধাভোগী শ্রেণী। হুগলি তথা বাংলার যে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রবর্তিত হয়েছিল সেই চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের যেসমস্ত পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা হয়েছিল তার সমস্ত চাপ পড়েছিল গিয়ে সাধারণ কৃষকদের উপরে। বাংলার অন্যান্য স্থানের মতো হুগলি জেলাতেও জমিদাররা সুখে শান্তিতে জীবন কাটাতো এবং সঠিক সময় রাজস্ব প্রদান করলে সূর্যাস্ত আইন অনুসারে তাদের জমি কেড়ে নেওয়া হত না। ১৭৯৩ সালে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রবর্তিত হলে এর প্রথম অভিঘাতে পুরনো জমিদার শ্রেণীর একটি বিরাট অংশের বদলে নতুন জমিদার শ্রেণীর আবির্ভাব হল এবং এইসব জমিদাররা বেশিরভাগই গ্রাম ছেড়ে শহরে বসবাস করতে থাকে এবং তার হয়ে তার কর্মচারীরা অর্থাৎ নায়েব, গোমস্তা প্রমুখরা রাজস্ব আদায় করতে থাকে। হুগলি জেলা অঞ্চলে বড় জমিদার বিশেষ ছিল না, এর বদলে ছিল প্রচুর পরিমাণে ছোট এবং মাঝারি জমিদার। ১৮১৯ সালের পড়ে যখন পত্তনিদার ব্যবস্থা আইনসিদ্ধ হল তখন এই নব পত্তনিদার শ্রেণী স্থানীয় ক্ষেত্রে তারা জমিদার বলে পরিচিতি পেতে শুরু করে। হুগলি জেলার বড় জমিদার ছিলেন ইটাচুনার কুন্ডু রাজ পরিবার, শ্রীরামপুরের গোস্বামী রাজ পরিবার, রাজহাট এর সাতআনি রাজ পরিবার, গুরাপের সিংহ রায় রাজপরিবার, দশঘরার সিংহ রায়পরিবার, মানকুন্ডুর খান রাজ পরিবার প্রভৃতিরা। এর বাইরেও ছিল অসংখ্য পত্তনি পরিবারগুলি।

১৭৯৩ সালের লর্ড কর্নওয়ালিস কর্তৃক চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রবর্তিত হওয়ার পর জমিদাররা বাংলার অন্যান্য প্রান্তের মতো হুগলি জেলাতেও স্থায়ীভাবে জমির মালিক হয়ে ওঠে এবং তাদের জন্য রাজস্ব হার স্থায়ীভাবে নির্ধারিত হয়ে যায়। অর্থাৎ ১৭৯৩ সালের চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রবর্তনের সময় কোন জমির রাজস্ব যদি কুড়ি টাকা থাকে তাহলে যখন চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত অবলুপ্ত হয় তখনও সেই জমির রাজস্ব কুড়ি টাকাই থেকে গিয়েছিল। সময়ের বিবর্তনের সাথে সাথে প্রভূত অর্থ সম্পদের কারণে জমিদাররা বিলাসব্যসনের মত্ত হয়ে ওঠে। ১৮১৯ সালে পত্তনিদার ব্যবস্থা প্রবর্তনের পরবর্তীকালে এই প্রবণতা আরো বৃদ্ধি পায়। ১৮১৫ সালের পরবর্তী সময়ে নব্য জমিদার শ্রেণীর উত্থান জমিদারদের বিলাসিতা এবং তার প্রকাশে অন্য মাত্রা দান করে।

প্রসঙ্গক্রমে এবার আমরা আলোচনা করব ইংরেজি ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি তথা লর্ড কর্নওয়ালিস কর্তৃক জারি করা চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের পরবর্তীকালে হুগলি জেলা অঞ্চলের জমিদারদের জীবনযাত্রা ঠিক কি রকম ছিল। বর্ধমান থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ার পর হুগলি জেলা অঞ্চল ছিল জমিদারি বন্দোবস্তের একটি অন্যতম কেন্দ্রবিন্দু। ছোট বড় মিলিয়ে হুগলি জেলাতে অসংখ্য জমিদারির অস্তিত্ব বিদ্যমান ছিল আলোচ্য সময়ে। এই জেলাতে উত্তরপাড়ায় জয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, প্যারীমোহন মুখোপাধ্যায়, জনাইয়ে কালীপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, ইটাচুনায় বিজয় নারায়ণ কুন্ডু কিংবা খানাকুলের রাজা রামমোহন রায়ের মতো বিখ্যাত এবং স্মরণীয় ব্যক্তিদের জমিদার হিসেবে কার্যপ্রণালী বিস্তৃত ছিল। উত্তরপাড়ার জমিদার পরিবারের শ্রেষ্ঠ জমিদার ছিলেন জয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় তার বিদ্যাবুদ্ধি, অধ্যাবসায়, যোগ্যতা, পাণ্ডিত্য, মেধা সবকিছুতেই তার তুলনা মেলা ভার। উনবিংশ শতাব্দীতে জন্মগ্রহণ করলেও তার দূরদৃষ্টি ছিল বর্তমান সময়ের মতো। আধুনিক মন, বিচার বুদ্ধি নিয়ে তিনি জন্মগ্রহণ করেছিলেন, তার মতো জমিদারের নাম এবং তার গুণাবলীর কাহিনী বাংলার বিভিন্ন প্রান্তে ছড়িয়ে পড়েছিল। জয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় তাঁর প্রাথমিক পড়াশোনা শেষ করে পিতার সাথে তৎকালীন যুক্ত প্রদেশের মিরাটে গিয়েছিলেন কারণ মিরাট ছিল তার পিতা জগমোহন মুখোপাধ্যায়ের তৎকালীন কর্মস্থল। মিরাটে এসে তিনি যে অভিজ্ঞতা অর্জন করেছিলেন সেটি পরবর্তীকালে তার জমিদারি ক্রয় করার ক্ষেত্রে বিশেষ কাজে লেগেছিল চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রবর্তনের পরবর্তীকালে সূর্যাস্ত্র আইনের প্রভাবে বহুসংখ্যক জমি নিলামে উঠলে তিনি তা ক্রয় করে নেন এবং হুগলি জেলার একজন অন্যতম বৃহত্তম ভূস্বামীতে পরিণত হন। তিনি ছিলেন পাঠাগার আন্দোলনের জনক। কলেজের গতানুগতিক পরিধির বাইরে লাইব্রেরী পাঠাগারের যে বিপুল ভূমিকা রয়েছে মানুষের যথাযথ শিক্ষার ক্ষেত্রে সে কথা তিনি সে যুগে উপলব্ধি করেছিলেন। তিনি মনে করতেন পাঠাগার জাতির ঐতিহ্য এবং উন্নতির ধারক এবং বাহক হিসেবে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিতে সক্ষম ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ এসে তিনি যথার্থ পাঠাগার নির্মাণ করার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেন। ১৮৬৯ সালে এপ্রিল মাসে জয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় লক্ষাদিক টাকার বিনিয়োগে উত্তরপাড়া লাইব্রেরী প্রতিষ্ঠা করেন, এটি ভারতবর্ষের প্রথম নিশুল্ক

পাঠাগার। তার প্রতিষ্ঠিত পাঠাগারে বিভিন্ন আধুনিক বৈজ্ঞানিক উপকরণ রাখার ব্যবস্থা করেন। এই বংশেরই একজন মেধাবী সন্তান ছিলেন প্যারীমোহন মুখোপাধ্যায় তিনি ছিলেন পিতার যোগ্য উত্তরাধিকারী উত্তরপাড়ায় বর্তমানে যে কলেজটি রয়েছে সেটি ও তারই নামে। জনাইয়ের কালীপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় ছিলেন একজন দেশপ্রেমিক জমিদার একই সাথে ইংরেজদের সাথেও তার সখ্যতা বজায় ছিল ব্রিটিশরা তাকে মহারাজা উপাধি প্রদান করেছিল। জনাই রাজবাড়িতে তৎকালীন যে দুর্গাপুজো হত, তা ছিল অতিব বিখ্যাত এবং সমকালীন সময়ে হুগলি জেলার যতগুলি দুর্গাপুজো হত, তার মধ্যে জনাই জমিদার বাড়ির দুর্গা পুজো ছিল অন্যতম সেরা। শুধুমাত্র রাজনৈতিক ক্ষেত্রে নয় জনাইয়ের জমিদারদের তৎকালীন সময়ে নাট্য আন্দোলনেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা দেখতে পাওয়া যায়। এই বংশের জমিদার পূর্ণচন্দ্র মুখোপাধ্যায় নীল চাষ করার জন্য একটি বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতি আবিষ্কার করেন। অপরদিকে ইটাচুনার কুন্ডু রাজ পরিবারের শ্রেষ্ঠ সন্তান ছিলেন বিজয় নারায়ণ কুন্ডু, তিনি ছিলেন বুদ্ধিমান এবং দূরদৃষ্টি সম্পন্ন একজন মানুষ বিজয় নারায়ণ কুন্ডুর সাথে ইংরেজদের যথেষ্ট সুসম্পর্ক বজায় ছিল এবং ব্রিটিশরা তাকে রাজা উপাধি প্রদান করেছিল।

বর্তমান সময়ে দাঁড়িয়ে অষ্টাদশ শতাব্দী শেষ দিকে এবং উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যে হুগলী তথা বাংলার জমিদারদের জীবনযাত্রা কি রকম ছিল সে বিষয়ে অনুসন্ধানের জন্য তথ্যের স্বল্পতা রয়েছে এই কারণে বর্তমান সময়ে দাঁড়িয়ে এই বিষয়টিকে নির্ণয় করা খুব সহজসাধ্য বিষয় নয়। প্রথমেই বলা যায় হুগলিসহ বাংলার জমিদার পরিবার গুলির পারিবারিক পরিধি ছিল ব্যাপক এবং জমি ছিল তাদের অর্থনৈতিক অবলম্বনের মূল ভিত্তি –

> “A ‘Zamindar ‘s family was wide in extent, embracing several generations and degrees of consinhood. The inner family lived on the income of the estate and the estate was expected to succour the distance member of the family.”[১]

জমিদারদের জমির আয়তন বিষয়ে বহুরূপতা বর্তমান ছিল সেই কারণে এবং বিভিন্ন জমিদারের জমিদারির আয়তন বিভিন্ন রকমের হত এবং তার সাথে সাদুর্য রেখে বিভিন্ন জমিদারের অর্থনৈতিক ক্ষমতাও বিভিন্ন রকমের হয়ে থাকতো। অর্থনৈতিক ক্ষমতার যেহেতু সামঞ্জস্য ছিল না সেই কারণে তার উপর নির্ভর করে গড়ে ওঠা জমিদার জীবন যাত্রার মধ্যেও নানা রকমের প্রভেদ স্বতন্ত্রতা এবং বৈচিত্র পরিলক্ষিত হত।[২]

জমিদারদের অর্থনৈতিক উৎস - চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের মাধ্যমে বন্দোবস্ত দেয়া জমির পাশাপাশি জমিদারদের অসংখ্য নামে বেনাম সম্পত্তি ছিল এর সাথে ছিল রাজস্বহীন জমি অর্থাৎ লাখেরাজ ভূমি। কোন কারনে জমিদাররা রাজস্ব পরিষদ করতে সক্ষম না হলে এই লাখেরাজ ভূমিগুলি থেকে সেই ঘাটতি তারা পূরণ করতো।[৩] এগুলি ছাড়াও জমিদারদের অনেকেরই একটি সাধারণ পরিচিত ব্যবসা ছিল এবং যে কাজে জোতদারদের অবদান কিছু কম ছিল না। সেটি হল মহাজনি কারবার অধ্যাপক সুভাষচন্দ্র সেন তার বইতে দেখিয়েছেন যে হুগলি জেলার বিখ্যাত জমিদার এবং বাংলা নবজাগরণের প্রাণপুরুষ রাজা রামমোহন রায়ও ছিলেন একজন বড় মাপের মহাজন।[৪] এছাড়াও ফসলের ব্যবসা, নীল আবাদ, বাণিজ্যিক শস্যের উৎপাদন এবং বহু রকমের ব্যবসা-বাণিজ্যের মাধ্যমে জমিদাররা প্রভূতভাবে যে সমৃদ্ধ হয়েছিল তার প্রকাশ ঘটতো তাদের জীবনযাত্রার মধ্যে দিয়ে।

প্রসঙ্গক্রমে বলা যায় যেহেতু বড় জমিদারদের অর্থনৈতিক আমদানি ছোট জমিদারদের থেকে তুলনামূলকভাবে বেশি ছিল, সেই জন্য বড় জমিদারদের জীবনযাত্রার মান স্বাভাবিকভাবেই ছোট এবং মাঝারি জমিদারদের থেকে পৃথক ছিল। তাদের জীবনযাত্রার মান ছিল যথেষ্ট উন্নত আবার পুরনো জমিদারদের জীবনযাত্রার মান বা জীবনকে অথবা অর্থনীতিকে দেখার প্রবণতা এবং দৃষ্টিভঙ্গি স্বভাবতই হঠাৎ করে গজিয়ে ওঠা নতুন জমিদারদের থেকে সম্পূর্ণভাবে স্বতন্ত্র ছিল। জমিদাররা ছিল গ্রামীণ সমাজ ব্যবস্থার মেরুদন্ড এবং সমাজের অন্যান্য শ্রেণী থেকে তারা সম্পূর্ণভাবেই স্বতন্ত্র ছিল তাদের অগ্রাহ্য করার ক্ষমতা কারো ছিল না। চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত জমিদারদের একটি সমগোত্রীয় মর্যাদা প্রদান করেছিল। পৃথক পৃথক জমিদার পৃথক পৃথক অধিকার এবং সুযোগ-সুবিধা ভোগ করবে এই বিষয়টির বদলে সমস্ত জমিদারবর্গকে একটি শ্রেণী মনে করে তাদের জন্য নির্দেশ জারি করা হত।[৫]

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - iv, October 2025, TIRJ/ October 2025/article - 74
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 626 - 632
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে জমিদাররা প্রচুর পরিমাণে সম্পদের অধিকারী হয়েছিল। এমনকি এগুলি নিয়েও তারা সন্তুষ্ট হতে পারেনি তারা এগুলির সাথে সাথে তারা জমির বিভিন্ন উপশত্ত্ব ক্রয় করতে থাকে ১৭৯০ সালের পরবর্তী সময়ে যেসব নব্য জমিদারদের উত্থান ঘটে এবং বিশেষ করে ১৮০০ এর পরবর্তীকালে উদ্ভব হওয়া নব্য জমিদারদের বেশিরভাগই ছিল ব্যবসায়ী জমিদার। এ প্রসঙ্গে উত্তর পাড়ার বিখ্যাত জমিদার জয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়ের নাম সর্বাজ্ঞে উল্লেখযোগ্য তিনি এবং তার পিতা ব্যবসার মাধ্যমে প্রচুর পরিমাণে অর্থ সম্পদ কেন্দ্রীভূত করেছিলেন এবং এই সম্পদ বিনিয়োগ করেছিলেন নতুন নতুন জমিদারি কেনার কাজে। এই অর্থনৈতিক ভিত্তির স্থিরতা এবং সক্রিয়তা জমিদারদের জীবনযাত্রার ধারাকে নির্মাণ করার প্রয়োজনে ব্যাপকভাবে সহায়তা করেছিল।

অর্থনৈতিক ক্ষমতার বহিঃপ্রকাশ এবং জমিদারি জীবনযাত্রা - বাংলার অন্যান্য স্থানের মতো হুগলি জেলার জমিদাররা ছিল একটি সুবিধা ভোগী শ্রেণী তারা নানা ক্ষেত্র থেকে সঞ্চয় করা প্রভূত অর্থের সাহায্যে তাদের জীবনযাত্রার মানকে বৃদ্ধি করেছিল। তারা নিজেরা কৃষিকাজ করত না তাই তাদের জীবনে কোন কায়িক পরিশ্রম ছিল না তাদের হাতে পড়েছিল অফুরন্ত সময়। যেহেতু ব্রিটিশদের সাথে তাদের সুসম্পর্ক বজায় ছিল এবং সময়ের সাথে সাথে ধীরে ধীরে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের মধ্যে সূর্যাস্ত আইনের কঠোরতা কমে এসেছিল এবং এই বিষয়টির জন্য চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত তাদের কাছে আর আতঙ্কের বিষয় ছিল না। তারা বিলাসিতায় এবং উশৃংখল জীবন যাপনে নিজেদের নিয়োজিত করেছিল এবং এ কাজে তারা সরকারকে পাশে পেয়েছিল তাদের উদ্দেশ্য পূরণের হাতিয়ার হিসেবে।

একজন জমিদারের সমস্ত স্বার্থের কেন্দ্রবিন্দু ছিল অর্থ জমিদার যে কোন বিষয়কে দেখত অর্থনৈতিক স্বার্থের আলোকে যেখানে তার লাভের সুযোগ আছে, যেখানে অর্থ আছে সেখানে জড়িত জমিদারদের আগ্রহ। তাই জমিদারি জীবনযাত্রার কাহিনী নিরূপণে এই অর্থে আলোচনাটি বারবার ফিরে এসেছে কোন জমিদারের ক্ষমতা কতটা তা বোঝা যাবে তার অর্থনৈতিক ক্ষমতার আলোকে। বিবাহ অনুষ্ঠান, পূজা অনুষ্ঠান, উপনয়ন, সামাজিক অনুষ্ঠান জমিদারদের ক্ষমতা প্রদর্শনের মাধ্যম। এই অনুষ্ঠানগুলির মধ্যে দিয়ে একজন জমিদার আর একজন জমিদারকে টক্কর দেয়ার চেষ্টা করতেন। বিদেশি অতিথিবর্গকে আমন্ত্রণ জানিয়ে তাদের কোন জমিদার কত বেশি মনোরঞ্জন করতে পারে এই বিষয়টি তাদের মর্যাদা বৃদ্ধি করত। কোন জমিদার তার বাড়ির পবিত্র অনুষ্ঠানে কত পরিমাণ টাকা খরচ করছে কত পরিমানে মানুষকে নিমন্ত্রণ করছে এবং সর্বোপরি অনুষ্ঠানে কি পরিমাণ ব্যয় করছে এই বিষয়টিকে কেন্দ্র করে জমিদারদের মধ্যে প্রবল লড়াই বিদ্যমান ছিল। বড় জমিদার থেকে শুরু করে মাঝারি এবং ছোট জমিদাররাও এই প্রতিযোগিতার থেকে নিজেদের দূরে রাখতে পারেননি। ভক্তির বদলে রাজনৈতিক উদ্দেশ্য পূরণের হাতিয়ার রূপে জমিদারদের বাড়ির অনুষ্ঠানগুলোকে বিবেচনা করা যেতে পারে। সামান্য কিছু জমিদার এই বিষয়গুলি থেকে দূরে থাকার চেষ্টা করতেন তবে বেশিরভাগ জমিদারি এই বিষয়গুলির সাথে সরাসরি যুক্ত ছিলেন।[৬]

বঙ্গদেশের অন্যান্য স্থানের মতো হুগলি জেলার জমিদারদের বাড়ির সবথেকে বড় বাৎসরিক উৎসব ছিল শারদ উৎসব অর্থাৎ দুর্গাপূজা। জমিদারদের বাড়ির মধ্যে জাঁকজমক করে দুর্গাপূজা অনুষ্ঠিত হত, বাড়িতে দুর্গাপূজা হতো না এরকম জমিদার বাড়ি হুগলি জেলায় খুঁজে পাওয়া খুব কঠিন, এমনকি এখনো জমিদারদের অনেক বংশধররা এই ধারাকে বহন করে নিয়ে চলেছেন। এ প্রসঙ্গে মাকালপুর জমিদার বাড়ির কথা বলা যায়, জমিদারি ঐতিহ্যকে স্বীকৃতি দিয়ে এবং প্রাচীন রীতি মেনে যথেষ্ট আভিজাত্যের সাথে এখনো দুর্গাপূজা সম্পন্ন হয় পূর্বের মতো পশুবলির সময় টোপ ধনী দেওয়ার রীতি এখনো সমানভাবে বর্তমান। হুগলি জেলার বেশিরভাগ জমিদার বাড়িতে দুর্গা প্রতিমাটি মূলত উক্ত জমিদার বাড়িতেই বিশিষ্ট শিল্পীদের দ্বারা তৈরি হতো। দুর্গাপূজার বিশেষ দিনগুলিতে হুগলি জেলার বেশিরভাগ জমিদার বাড়িতেই নরনারায়ন সেবার আয়োজন করতেন পূর্বের মতো এখনো সেই প্রথা অক্ষুন্ন রয়েছে। এত গেল ভক্তির দিক, এই দুর্গা পুজোতে কে কত পরিমাণে ব্যয় করতে পারবে, কে কতটা জাঁকজমক করে দুর্গাপূজা আয়োজন করতে পারবে, এই নিয়ে জমিদারদের মধ্যে ছায়া যুদ্ধের মতো পরিস্থিতি তৈরি হত। একজন জমিদার দুর্গা পূজার আয়োজন এর খরচ এর দিক থেকে অন্য জনকে টক্কর দেয়ার চেষ্টা করতেন এ কথা বলা বাহুল্য যে ছোট এবং মাঝারি জমিদাররা এই একই রকম প্রতিযোগিতা সাথে যুক্ত ছিলেন ছোট এবং মাঝারি জমিদাররা বড় জমিদারদের এই কার্যকলাপগুলিকে অনুকরণ করার চেষ্টা করতেন।

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - iv, October 2025, TIRJ/ October 2025/article - 74
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 626 - 632
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

দুর্গাপুজোতে প্রশাসনের বিভিন্ন শাখার সাথে যুক্ত এবং সর্বোপরি নানা উচ্চপদস্থ প্রশাসনিক কর্মচারীদের বিভিন্ন অর্থনৈতিক ক্ষমতাশালী ব্যক্তিদের জমিদার তার বাড়িতে আমন্ত্রণ করতেন। এদের আমন্ত্রণ না করলে জমিদারদের দুর্গাপূজার সার্থক বলে প্রতিপন্ন হত না, কে কত বড় উচ্চপদস্থ কর্মচারীদের আমন্ত্রণ করতে পারে এই বিষয়টি নিয়ে জমিদারদের মধ্যে প্রবল প্রতিযোগিতা ছিল এবং এটি ছিল সাধারণ মানুষের কাছে ক্ষমতা প্রদর্শন এবং সামাজিক স্বীকৃতি আদায়ের একটি মাধ্যম।

> "The Durga puja, births, marriages and deaths were thus the principal occasion when the zamindars visit with each other in spending money and tried to make people marvel at their wealth and bounties."[৭]

উচ্চপদস্থ কর্মচারীদের মনোরঞ্জনের জন্য জমিদাররা তাদের জমিদার বাড়িতে নাটক, বাইজি নাচ প্রভৃতির আয়োজন করত সেখানে অংশগ্রহণ করত পেশাদার শিল্পীরা, এইসব অনুষ্ঠানে নিয়ন্ত্রণহীন ভাবে মদ্যপানে প্রচলন ছিল। হিন্দু মুসলিম নির্বিশেষে বিভিন্ন পেশার মহিলা নৃত্যশিল্পীদের নাচ উচ্চ পদস্থ কর্মচারীদের সামনে পরিবেশন করা হত। অনুষ্ঠানগুলি প্রধানত সন্ধ্যেবেলা থেকে শুরু করে সারা রাত্রি অব্দি চলত যেহেতু ইংরেজরা চেয়েছিলেন জমিদারদের সাথে সুসম্পর্ক বজায় থাকুক এবং এদেশের মাটিতে জমিদাররা তাদের একটি সমর্থক হিসেবে গড়ে উঠুক সেই জন্য এইসব অনুষ্ঠানে ব্রিটিশদের আগ্রহের অভাব ছিল না তারা এসব অনুষ্ঠানে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করতেন। ভারতবর্ষের ইতিহাসে প্রথম আধুনিক মানব নামে পরিচিত রাজা রামমোহন রায় পর্যন্ত এই ধারা থেকে নিজেকে মুক্ত রাখতে পারেননি Fanny Parkes তার দিনলিপিতে লিখেছেন যে –

> "1823, May – The other evening we want to a party given by Ram Mohan Roy, a rich Bangallee baboo; The grounds, which are extensive, were well illuminated, and excellent fireworks displayed. In various rooms of the house bach girls were dancing and singing was curious; at times the tunes proceeded finely from their noses; some of the airs were very pretty; on be of the women was nicker, the catalano of the east."[৮]

বাংলার অন্যান্য স্থানের মতো হুগলি জেলা জমিদারদেরও দরবার ছিল। এই দরবার ছিল তাদের ক্ষমতার প্রকাশের একটি অন্যতম হাতিয়ার। তারা যে সাধারণ মানুষের থেকে কিছুটা পৃথক, তাদের দরবারের কায়দা কানুন থেকে এটা পরিষ্কারভাবে প্রমাণিত হত –

> "Most of the zamindar rank and status held regular darbar, The audience was composed of regular visitors, estate officeres local gentry, poets, pandora, etc."[৯]

জমিদারদের নিয়ম করে দরবার বসত বহু ক্ষেত্রে তারা সাধারণ মানুষের অভাব অভিযোগের এবং সর্বোপরি তাদের মধ্যে চলা বিরোধের মীমাংসা করে দিতেন সালিশির মধ্যে দিয়ে এবং প্রয়োজনে উক্ত ব্যক্তিকে দৈহিক এবং অর্থনৈতিক শাস্তি প্রদান করতেন। জমিদারদের দরবারে কবি, সাহিত্যিক, পন্ডিত, পুরোহিত, লেখক সহ বহু বিশিষ্ট মানুষের সমাবেশ ঘটত, এই অর্থে তারা ছিল স্থানীয় রাজা। জমিদারদের রাজদরবারে নাচ, গান ইত্যাদির ব্যবস্থা ছিল। জমিদারদের দরবারে নিত্য এবং গীত পরিবেশন করতে হুগলি জেলা অঞ্চলসহ বঙ্গদেশের বিভিন্ন জেলা থেকে এবং পার্শ্ববর্তী শহরতলী থেকে এইসব শিল্পীদের ভাড়া করে আনা হত। এটিই ছিল জমিদারদের ক্ষমতা প্রদর্শনের আরও একটি উদাহরণ, জমিদারদের দরবার ছিল যথেষ্ট নিয়ম-নিষ্ট প্রকৃতির চিৎকার, কোলাহল, অশান্তি ছিল দরবারে নিয়ম বিরুদ্ধ। নাচ গানের সময় দরবারের পারিপার্শ্বিক পরিবেশ ছিল যথেষ্ট অনুষ্ঠানিক এবং নিয়ম-নিষ্ঠ।

সমকালীন সময়ে প্রকাশিত হওয়ার সংবাদপত্রগুলি এবং দিনলিপিগুলি থেকে এই বিষয়টি পরিষ্কারভাবে বোঝা যায় যে - কি ব্যাপক পরিমাণে জমিদাররা ধর্মীয় ক্ষেত্রে, সামাজিক উৎসব অনুষ্ঠানের ক্ষেত্রে অর্থ খরচ করতেন। জমিদার

মন্দির নির্মাণ করত, গরিব দুঃখীদের দান করত, এছাড়া জমিদাররা তাদের নিজের প্রয়োজনে এবং নিজেদের গরিমা বৃদ্ধি করার জন্য বড় বড় আবাসস্থল নির্মাণ করতেন।

> "One of the important aspect of a Zamindar's life was his building activities."[১০]

তাছাড়াও রাস্তাঘাট, পুষ্করিনী, খাল খনন প্রভৃতির কাজে জমিদাররা নিয়োজিত থাকতো। দরবারী সংস্কৃতি যেমন জমিদারদের জীবনযাত্রার একটি অন্যতম ক্ষেত্র বলে বিবেচিত হয়েছিল ঠিক তেমনি মন্দির ছিল জমিদারদের জীবনযাত্রার অপর একটি অঙ্গ। জমিদারদের জমির মধ্যে তাদের কুলো দেবতার মন্দির ছিল। জমিদাররা ধর্মের বিভিন্ন ধারায় বিশ্বাসী ছিলেন কোন কোন জমিদার ছিলেন শিবের ভক্ত আবার কোন কোন জমিদার ছিলেন বৈষ্ণব ধর্মনিরপেক্ষ জমিদারদের অস্তিত্ব দেখতে পাওয়া যায় এদিক থেকে দেখতে গেলে জমিদারদের জনহিতকর ভূমিকা নানাদির চোখে পড়ে। নিজের জমিদারি ছাড়াও জমিদাররা বিভিন্ন ধর্মীয় পুণ্যক্ষেত্র বিষয়ক স্থানগুলিতে মন্দির নির্মাণ করে দিত পূর্ণ অর্জনের তাগিদে। প্রতি বছর নিয়ম করে পবিত্র তীর্থস্থানগুলিতে ভ্রমণ জমিদার জীবনযাত্রার একটি অঙ্গ ছিল এ প্রসঙ্গে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের নাম করা যায়। হুগলি জেলার জমিদারদের দ্বারা সংঘটিত হওয়া জনকল্যাণমূলক কাজের কিছু পরিসংখ্যান নিম্নে প্রদান করা হল -

১. ত্রিবেণী ব্রিজ নির্মাণ করেছিলেন প্রাণকিষেন হালদার।
২. পুরনো বেনারস রোড থেকে জনাই পর্যন্ত রাস্তা নির্মাণ করেছিলেন জনাইয়ের জমিদার রামনারায়ণ মুখার্জি।
৩. হাট বদনগঞ্জ থেকে জিরাট পর্যন্ত রাস্তা নির্মাণ করেছিলেন মদন দত্ত নামক জমিদার।
৪. মগরা থেকে ভাস্তারা পর্যন্ত রাস্তা নির্মাণ করেছিলেন ছকুরাম সিং নামক জমিদার।
৫. ঘোলঘাট নির্মাণ করেছিলেন রামকুমার রায় নামক জমিদার।[১১]

বাংলা তথা হুগলি জেলার জমিদারদের ক্ষমতাকে ধরে রাখা এবং ক্ষমতা প্রদর্শন এর অন্যতম একটি হাতিয়ার ছিল জমিদারদের লাঠিয়ালরা। স্থানীয় এলাকায় শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য জমিদারদের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল –

> "The zamindar are declared responsible for the preservation of the peace of their district."[১২]

জমিদারদের জমিদারির মধ্যে অনেক সংখ্যক লাঠিয়াল থাকতো সবস্তরের জমিদারই লাঠিয়াল রাখার চেষ্টা করত। লাঠিয়ালরা জমিদারদের নিরাপত্তা দিত এবং জমিদারি অত্যাচারের জন্য কৃষকদের মধ্যে যে খুব বিক্ষোভ দীর্ঘদিন ধরে জন্ম নিয়েছিল সেই সম্পর্কে অতি সচেতন জমিদাররা লাঠিয়ালদের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেছিলেন। লাঠিয়ালদের সংখ্যার তারতম্যের নিরিখ দুইজন জমিদারের মধ্যে ক্ষমতার উচ্চ-নিচ বিবেচিত হত, এই লাঠিয়ালদের উপর নির্ভর করেই জমিদাররা সাধারণ মানুষের কাছ থেকে অতিরিক্ত উৎকোচ আদায় করতেন যদিও চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের আইনে এ সম্পর্কে নানা বাধা নিষেধ ছিল -

> "That the zamindar is not authorised to impose and new abwab or muthole,or and pretence whatever, upon the ryots; and every exactgion of this nature, to be punished by a penalty equal to three times the amount imposed."[১৩]

সর্বোপরি জমিদারি অত্যাচার, অনাচার এর জন্য গ্রাম বাংলার দরিদ্র কৃষক জীবনে দীর্ঘদিন ধরে যে আগুন জ্বলছিল সেই আগুনে লেলিনহান শিখা যাতে সর্বত্র ছড়িয়ে না পড়ে এবং জমিদারের কোন অর্থনৈতিক ক্ষতি না হয় সেজন্য লাঠিয়াল্লা ছিল জমিদারদের অন্যতম হাতিয়ার এবং একই সাথে লাঠিয়াল ছিল জনগণের কাছে আনুগত্য আদায় করার আবেদনও বটে।

বাংলার অন্যান্য স্থানের মতো হুগলি জেলাতেও জমিদারদের জীবনে প্রচুর সময়ের অবকাশ ছিল এবং ক্রমাগত ইংরেজদের সংস্পর্শে এসে জমিদার পরিবারগুলির এই ধারণা হয়েছিল যে তাদের সন্তানদের যথচিত শিক্ষা প্রদান করার প্রয়োজন রয়েছে এর সাথে সাথে ব্রিটিশদের সংস্পর্শে থাকার কারণে তারা পাশ্চাত্য সভ্যতা, প্রাশ্চাত্য ভাষা এবং সর্বোপরি

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - iv, October 2025, TIRJ/ October 2025/article - 74
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 626 - 632
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

পাশ্চাত্য যুক্তিবাদের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে পড়েছিল এবং সময়ের সাথে সাথে আমরা দেখতে পাই জমিদারদের পুত্র-কন্যারা শিক্ষিত হচ্ছে এবং সময়ের অবকাশের কারণে যে কোন বিষয় সম্পর্কে জানার এবং ভাববার সুযোগ তারা পেয়েছিল।

হুগলি জেলায় এই জমিদার শ্রেণীর মধ্যে থেকে উঠে আসা রাজা রামমোহন রায়ের হাত ধরে প্রচলিত হিন্দু ধর্মকে সংস্কার করার জন্য এবং এর সাথে সংযুক্ত বিচ্ছিন্নতাবোধ, বহু ঈশ্বরবাদ, জাতিভেদ প্রথা, পৌত্তলিকতা প্রভৃতির জন্য সংঘটিত হওয়া বিরোধের মীমাংসার জন্য প্রচেষ্টা করা হতে থাকে।[১৪] তিনি তার এই ধর্মের ধারণার উপর নির্ভর করে মানব জীবনের আধ্যাত্মিক মুক্তি চেয়েছিলেন এবং তার ধর্মের ধারণা শুধুমাত্র শুষ্ক তাত্ত্বিক ধারণার উপর নির্ভরশীল ছিল না, তিনি একে ব্যবহার করেছিলেন মানব মুক্তি সংগ্রামের হাতিয়ার হিসেবে ভারত পথিক রাজা রামমোহন রায়ের ধর্ম সম্পর্কে এই ধারণা তার কর্মযোগের পথকে প্রশস্ত করেছিল[১৫] এবং সর্বোপরি তার এই মানসিকতা এবং ধারণা তাকে একজন সফল সমাজ সংস্কারকে পরিণত করেছিল, তিনি ছিলেন আত্মীয় সভা এবং ব্রম্ভ সভার প্রতিষ্ঠাতা। ১৮২৮ সালে ২০ আগস্ট তিনি ব্রম্ভ সভা প্রতিষ্ঠা করেন। সম্প্রদায়বিহীন এক সার্বজনীন ধর্মের তিনি ছিলেন স্থপতি। মুসলিম, খ্রিস্টান, বৌদ্ধ, জৈন যে কোন ধর্মের ভালো দিক গ্রহণের ব্যাপারে তার আগ্রহ এবং আন্তরিকতার কোন অভাব ছিল না। তার দীর্ঘ লড়াইয়ের স্বীকৃতি হিসেবে ইংরেজরা দীর্ঘদিন ধরে হিন্দু সমাজের ভিতর সক্রিয় প্রথা হিসেবে চলে আসা সতীদাহ প্রথা তুলে দিয়েছিল আইন করে।

Reference:

১. Islam, Sirajul, The Permanent Settlement in Bengal: A Study of its Operation 1790- 1819, Bengal Academy, Dhaka, 1979, P. 358

২.. Ibid., P. 331

৩. Palit, Chitrabrata, Tension in Rural Bengal Society, Land Lords Planters and Colonial Rule, 1830-1860, P. 110

৪. Sen, Subhas Chandra, The Landed Middle Class And Their politics In Hooghly; A Study And Horizontal Mobilization 1859-1914, Progressive Publisher, Kolkata, 2003, P. 223

৫. W K. Ferminger, On The Affairs of the East India Company, The Fifth Report from the Select Committee Of the House of Commons on the Affairs of the East India Co. R. Company & Co. Calcutta, 1917& 1918. P. 136

৬. Sirajul, Islam, Op, Cit., P. 340

৭. Ibid, P. 345

৮. Francis Floud, Midnapore Zamindari, Report Of the Land Revenue Commission: Bengal, B.G. Press, Alipur, 1940, P. 289

৯. Ibid, P. 283

১০. Sirajul, Islam, Op, Cit., P. 358

১১. George Toynbee, A Sketch of the Administration of The Hooghly District from 1795-1845, The Bengal Secretariat Press, Calcutta p. 267

১২. W K. Ferminger, Op, Cit., P. 145

১৩. Ibid, P. 143

১৪. Naskar, Sanat Kumar, Maharshi Debendranath Tagore Dwisatabarsher Shraddhanjali, Diya Publication, Kolkata, 2018, P. 11

১৫. Ibid, P. 11